মারমুখী হিন্দু

শিবপ্রসাদ রায়

মারমুখী হিন্দু

শিবপ্রসাদ রায়

৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নস্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

।। মারমুখী হিন্দু ।।

স্বামিজী অপ্রকট হবার আগে আমাকে একটা কথাই বারবার বলতেন ঃ দেখো নিবেদিতা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উপনিষদের গভীরে প্রবেশ করে একটা সত্যই উপলব্ধি করছি। জগৎ এবং জীবনের শেষ কথা হচ্ছে শক্তি। যার কাছে শক্তি থাকবে সর্ববিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকারী সেই। অনিচ্ছার সঙ্গেও জগৎ তা মানতে বাধ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে যে ব্যক্তি যতো বেশি ধার্মিক সে ততো বেশি নিরীহ গোবেচারা এবং দুর্বল। তাই তাদের লাঞ্ছনা নির্য্যাতিনেরও শেষ নেই। যে যতো ভদ্রলোক সে ততো অসহায়। তার কারণ শক্তিহীনতা। উচ্চ দর্শন মহৎচিন্তা বনহকারী হিন্দু সমাজের ইতিহাসটাই শুধু মার খাবার আক্রান্ত হবার বিবরণে পূর্ণ। এতে কোন হিন্দুর ব্যথা বেদনা অপমানবোধ নেই। দুর্বলদের এসব থাকেও না। ন্যায়মাত্মা বলহীনে ন লভ্য। হিন্দুকে শক্তিশালী হতেই হবে। পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে *Hindu msut be aggressive and must be fanatic.* স্বামিজীর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। তাঁর কথায় ভারত আত্মার যন্ত্রণাই চীৎকৃত হয়েছে। হাজার বছর বিদেশী অপশাসনে ভারতবর্ষ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নজীর বিহীন অত্যাচার ধ্বংস এবং হননের শিকার হয়েছিল। নিরন্তর অত্যাচারের ফলে আত্মবিস্মৃতি হীনমন্যতা এবং আত্মরক্ষায় অনীহা তৈরি হলো। আজও যখন সনাতন ধর্ম ও সংস্কারকে অপব্যাখ্যা কিম্বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়, হিন্দু প্রতিবাদের কথা ভাবতে পারে না। তাতে অংশগ্রহণ করে অথবা অপরাধীর মত আচরণ করে। অন্যদের ধর্মীয় ধ্যান ধারণার যুক্তিহীনতা কুফলের দিকগুলো দেখিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে না। নিজের ঐতিহ্যকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে চাই শক্তি এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গী।

স্বামিজীর ভাষায় চাই ফ্যানাটিক এবং মারমুখী হিন্দু। আমিও মনে করি আজকের দিনে আক্রমণই হবে ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা সমাজের সর্বত্র এমনকি বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলিতেও চাই। আক্রমণ। আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধ্বংসকারীদের প্রতি আক্রমণ। আক্রমণের ভাবনা ও আদর্শ।

হাজার বছর ধরে একটি জাতি তো শুধু অসহায়ভাবে আত্মর[illegible] করে গেছে। তাতে প্রতিপক্ষ কোথাও থেমে যায়নি। হিন্দু জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও দেখায়নি। অন্যের শ্রদ্ধা সহানুভূতি অর্জনের জন্যই হিন্দুকে জঙ্গী আক্রমণশীল মারমুখী হতে হবে। নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ নয় সক্রিয় প্রতিরোধ চাই। দুর্বলতার পতাকা নয়, চাই শক্তির মানদণ্ড। ধীরস্থির গতিতে প্রতিপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। তার বদলে চাই অভিযানকারী সৈন্যাধ্যক্ষের জয়োল্লাসের ঘন্টাধ্বনি। এভাবে শুধুমাত্র মনের অভিব্যক্তির পরিবর্তন সাধনাই বিপ্লব ঘটায়। হিন্দু জাতির সব আছে। শুধু চাই একটু মারমুখী ভাব। সেটা নিজেদের মধ্যে নয়। শত্রুদের জন্য। এই পরিবর্তন এক যুগের মধ্যেই সকলের মধ্যে দেখা দেবে। এই বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের চরিত্রে জঙ্গী হিন্দুত্বের গুণগুলি যুক্ত করতে হবে এবং আমাদের চরিত্রে যে ত্রুটিসমূহ আছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা আমাদের সামাজিক চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায় তার সন্ধান করতে হবে। এভাবেই আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ব বা মারমুখী হিন্দুত্বের কথা বলা সম্ভব হবে। প্রথম পদক্ষেপটি নেবার আগে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে আমাদের স্বচ্ছ ভাবনা চিন্তা থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে আমাদের ধর্মীয় রীতির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে চরিত্রগঠন। কতকগুলি প্রণালী এবং অভ্যাসের দ্বারা শরীর ও মনের একটা বিশেষ কাঠামো তৈরি করা। তবে অভ্যাস শেষ কথা নয় শেষ কথা চরিত্র। কোন অবস্থাতেই হিন্দু তার সংযম চরিত্রের কথা ভুলবে না। এ বিষয়ে

কোন বিতর্কই থাকতে পারে না। যে ভারতের বহু বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিমার্জন এবং গতিশীল সংস্কারের ফলে হিন্দুত্বের জীবনধারা পৃথিবীর মধ্যে আজও এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী।

বিভিন্ন সময়ে বিদেশী আক্রমণে এবং বিদেশী ভাবধারার চাপে বহমান সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে আবিলতা জমেছে। তবে তা নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত এবং তাৎক্ষণিক। তার প্রমাণ ভারতই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে এক কপর্দ্দকহীন পরিব্রাজক সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে একজন রাজাধিরাজকেও অতিক্রম করতে পারে। এর চেয়েও মহিমময় ব্যাপার হলো যে এখানে একজন কৃষক রাজা জনক হতে পারেন, আবার একজন ভিখারী হতে পারেন শুকদেব। তাহলে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে আমরা হিন্দুত্বকে আর হিন্দুরীতির সংরক্ষক বা ধারক বলে মনে করি না। দেখি হিন্দুচরিত্র স্রষ্টারূপে। এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় যে হিন্দুদর্শন এবং জীবনবোধে কতো সূক্ষ্মভাবে মানব মনে কাজ করে যায়। ধারণা এবং কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এগুলো ঢাকঢোল পিটিয়ে গায়ের জোরে ইহলোকিক জগত কিম্বা পরলোকের ভয় অথবা প্রলোভন দেখিয়ে করতে হয় না। স্বাভাবিক জীবনক্রমের মতো, অনেকটা ফুলের মতো ধীরে ধীরে ভেতর থেকেই ফুটে ওঠে। আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সচেতনাতার ওপর অবৈধ সীমালঙ্ঘনের কথা ভেবে ভয়ে বা ঈর্ষায় কাতর হই না। বাস্তবে এখন সীমালংঘনের ভাবনার মতি ঘটেছে। এখনকার কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন আমাদের কাজ শুধুমাত্র কোনক্রমে আত্মরক্ষা নয়। অন্যদের ধর্মান্তরিত করে আমাদের মধ্যে আনাটাই জরুরী। যুক্তিযুক্তভাবে কেবল আমাদের যা আছে তা ধরে রাখবার জন্য দৃঢ় সংকল্প আর যথেষ্ট নয়। আমরা সেসবও জয় করে নিতে চাই যা আমাদের ছিল না। অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে তা

জানা আছে তা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন নয়। আমরা তাদের নিয়ে কি ভাবছি সেটাই এখন মৌলিক প্রশ্ন।

আমার প্রভু গুরু স্বামী বিবেকানন্দ অকারণে বলেননি ঃ একটি হিন্দু হিন্দুধর্ম ছেড়ে অন্যধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দুর একটি সংখ্যা কমে না একজন শত্রু বাড়ে। অতএব আর আমরা হারাতে বা শত্রুবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারি না। আমরা কি রেখেছিলাম তার কতটুকু আছে এ প্রশ্ন আজ গৌণ বরং আমরা কতোটা সম্প্রসারিত হলাম কি সংযোজন করলাম সেটাই আজ বিবেচ্য বিষয় হবে। কারণ আজ গোটা জাতির একটাই প্রতিজ্ঞা আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাব দূর সীমান্তে। বশ্যতা অধীনতার স্বপ্ন আর নয়। আমরা জেনেছি একমাত্র সংগ্রামই দূরবর্তী বিজয় প্রাপ্তির প্রথম সোপান। একটি নির্মম সত্য যেন আমরা আবেগে ভুলে না যাই। জগতে কোন ধর্মীয় চিন্তাই হিন্দুত্বের মতো উদার প্রগতিশীল এবং রূপান্তর যোগ্য নয়। নাগার্জ্জুন এবং বুদ্ধদেবের কাছে ভূমাই সত্য জীব মিথ্যা। শংকরাচার্যের নিকট ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবনায় ব্রহ্ম ও জীব একই সত্য যা মানব চৈতন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়েছে। আমরা কি এসবের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি? এর অর্থই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা বা জীবনের সামগ্রিকতা। এর অর্থ ধর্মকে সমাজকে বা অন্যকে রক্ষা করা মোক্ষলাভের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়।

মুমুক্ষাকে জয় করার মধ্যে আছে চূড়ান্ত মুক্তি। এর অর্থ দাঁড়ায় সন্ন্যাসের উচ্চতম রূপ হচ্ছে বিজয়। জীবন থেকে সংগ্রাম থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি সন্ন্যাসও নয়, আধ্যাত্মিকতাও নয় হিন্দুত্ব তো নয়ই। সংক্ষেপে এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে হিন্দু ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝখানে মা কালীর ভেরী নিনাদিত হচ্ছে। আমাদের যা কিছু মহৎ যা কিছু

সুন্দর যা কিছু তেজোপূর্ণ সাহসিক তাকেই আহ্বান করছে এমন সমরাঙ্গনে যেখানে থেকে পশ্চাদপসরণের তূর্য্যধ্বনি আর কখনো শোন যাবে না। প্রাচীন ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণে বহু শতাব্দীর শ্রদ্ধাসমন্বিত ভাবনাধারার ওপর আধুনিক সংক্রমণের ভারতকে তো একটা সংকট অতিক্রম করতে হবেই। এমনকি দু একটি প্রজন্মের বৌদ্ধিক বিভ্রান্তিও সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপার। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো তার গতিকেও সহজে মানিয়ে নেওয়া। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব এক ধরনের নতুন ভাষাকে আত্মসাৎ করা আদর্শ একটি সংস্কৃতির প্রতিটি ধাপে ধাপে পরিবর্তন আনা এটা কি সামান্য কাজ? এই ঘটনার কি প্রতি তুলনা দেওয়া যায়? যায় না। এর উত্তরে জাপানের নাম করা নেহাৎই বোকামী।

উনবিংশ শতকের জাপানের সমস্যার সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষের কোন তুলনাই চলে না। একটি মাত্র মূল উৎস ও একান্তে অবস্থান জনিত, এক দৃঢ় অনুভব বিশিষ্ট ঘন বিন্যস্ত ক্ষুদ্র এবং দ্বীপবাসী জাতি যে কোনদিকে স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম। আজকের ভারতবর্ষে যে জনসংখ্যা অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথা বলতে পারে তা দু তিনটি জাপানের লোক সংখ্যার সমতুল হবে। এটাকে থামিয়ে দেবার নানান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংরাজীর জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকবে। এ পর্য্যন্ত ঝামেলাটা হচ্ছে যে এদেশের মানুষেরা বর্তমানের মতো অতীতের সংস্কৃতির প্রতিও উদাসীন। যে ভূমিতে হাজার হাজার বছর ধরে বোঝানো হয়েছে যে জীবন ও চিন্তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে আত্মাকে নিরাসক্ত নির্বিকার নির্লিপ্ত রাখা। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রূপে জড়তা আলস্য কর্মবিমুখ প্রাণহীনতা জাতিকে আচ্ছন্ন করতেই পারে। সেখানে হঠাৎ প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মশক্তিকে সক্রিয় করে তোলা ও পারস্পরিক সহযোগীতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া খুব সহজ এবং

মসৃণ কাজ নয়। তবুও স্বীকার করতে হবে ভারতের নিচুতলার সমাজে এখনও যথেষ্ট শক্তিমত্তা বিদ্যমান। ওপর তলার মানুষের তুলনায় তাদের হতাশা এবং নীতিভ্রষ্টতাও কম। অভাব অনটন অজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদের জীবনে আমাদের দর্শনের একটা স্বাভাবিক সরলীকরণ হয়ে গেছে। সব কিছুর পরেও ভারতবর্ষ আজ নতুন যুগের প্রবেশদ্বারে পদক্ষেপ করতে যাচ্ছে। ভাটার টান এর মধ্যেই শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। দীর্ঘদিনের অবসন্নতার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র।

১৮৫৮ সাল থেকে পরবর্তীকাল পর্য্যন্ত ভারতীয়দের এক আধুনিক চেতনার অঙ্গীভূত হওয়া ছাড়া সম্ভাব্য অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। গত্যন্তরও ছিল না। এটা কোন বাধ্যতা নয় একেই বলে ঐতিহাসিক নিয়তি। সে সময় ইতিহাসের মধ্যযুগীয় ধারাটি শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। পৃথ্বীরাজ ও শাহজাহান অশোক ও আকবর এক সাধারণ বিস্মৃতির মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যে দেশকে তারা শাসন করেছিল পরিচালনা করেছিল সেই দেশ ও জাতি রয়ে গেল নিজেকেই এক নতুন কর্মে আহ্বান করতে। নিজ ক্ষমতায় নতুন এক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। তাতে তার উত্থান বা পতন যাই হোক না। অদ্যাবধি কালাতিক্রমণের শ্রান্তিতে জাতীয় মানসের পক্ষে সমস্যাটি বিবেচনা করা সম্ভব ছিল না যাতে সে তার স্থিতিকাল সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পারে বা বর্ণনা করতে পারে। আজ সেই প্রাথমিক অবস্থার অবসান ঘটে গেছে। ভারতীয় মানস আর ক্রিয়াশক্তি রহিত অবস্থায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে প্রস্তুত নয়। সে নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছে নিজের সামর্থ্যে অতীতও বর্তমান উভয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরীপ করার জন্য যা কিনা তার ভবিষ্যত দিক নির্ণয়ের পূর্বাভাস দিতে পারে। কেবলমাত্র স্বদেশের মাটিতে দৃঢ়মূল বৃক্ষই আমাদের মস্তকে পত্রপুষ্পের মুকুট প্রদান করতে পারে। একই

ভাবে একান্ত পরিবেশের দাবির প্রতি যে হৃদয় সাড়া দেয়। যে অন্তঃ প্রকৃতি নিজ নিজ নাগরিক কর্তব্যের সীমা যতাযথ ভাবে পূর্ণ করে। শুধুমাত্র সেই হৃদয় ও মনই ঠিক ঠিক উদার সমাজে স্থান করে নিতে সক্ষম। কেবল স্বাদেশিকতাপূর্ণ মনই সম্ভবতঃ উদার জাতীয়তার মধ্যে তার অবদান রাকতে পারে। চিন্তায় ও আচরণে উদার জাতীয়তাবোধে উত্তীর্ণ হওয়া সকলের পক্ষে সহজ কাজ নয়। একমাত্র নিজ জাতীয়তার পূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে কিছু মানুষ এটা অর্জন করতে পারে। এটা তা সত্য বিশ্ব ধারনার মধ্যে স্থানীয় ভাবনাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে বিশ্বজনীনতা।

একটা কথা মনে গেঁথে রাখা উচিত যে সংস্কৃতি মানে কিছু তথ্যপঞ্জী নয়। দীর্ঘকালীন আচরণগত অভ্যাস এবং দিগন্ত বিস্তৃত এক অনুভূতির বিষয়। বিষয়টা এখন এভাবে দেখা যাচ্ছে যে সমষ্টিগত ভাবে মানবতা বোধের উন্নতি সাধন আধুনিক শিক্ষার এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। শুধু ভূগোলের জ্ঞান দিয়ে এটা অর্জন করা যায় না। বিশ্বের ঐক্য বিধান প্রচেষ্টায় মানবচিত্তের অনেকটা মুক্তি এসেছে। আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পারছি যে মনুষ্য চরিত্র তার অর্জিত এবং ক্রমে অঙ্গীভূত অভিজ্ঞতার যোগফল স্বরূপ। অন্য কথায় তার ইতিহাস তার মুখমন্ডলে ফুটে ওঠে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাকেই সত্য দেখি। এই অমোঘ রেখাচিত্রটি মানুষের সকল আশা ও স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের বিশদ করে বলে দেয় কোন্ ঐতিহ্য রেখে তারা এগিয়ে চলেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে ভূগোলের মতো ইতিহাসও আধুনিক চেতনার ক্ষেত্রে সমান অপরিহার্য্য। এটা যেন সত্যের দ্বিতীয় মাত্রা। অনাবৃর্ত এবং চিরপ্রগতিশীল। আমরা যাকে খুঁজে চলেছি। ভারতীয় মানস সামগ্রিকভাবে বিশ্বে স্বদেশের অবিচ্ছেদ্য এবং গচ্ছিত অংশ জয় বা অধিকার

করার চেষ্টা করেনি বহুকাল। তাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এবং সে যা কিছু পেয়েছে, আধুনিক বস্তু এবং চিন্তা, সবই সে অনুগতের মতো সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক প্রজন্ম ধরে ভারতীয়গণ যেন স্বপ্নের ঘোরে বিচরণ করেছে। তখন তার না ছিল পৌরুষ না ছিল পরিবেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার শক্তি। বলতে কষ্ট হলেও একথা সত্য যে সে ছিল সাধারণ জ্ঞান বর্জিত। তাই প্রদত্ত বস্তুগুলি তাকে ভাবায় নি। তার নতুনত্ব এবং অপরিচিতি তাকে অবাক এবং হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর সেকথা বলা যাবে না। সাগ্রহে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের ফলে আমরা ওগুলো পিছনে ফেলে রেখেছি। মনস্থির করে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি জীবন একটি সংগ্রাম বিশেষ। এখন আমরা আমাদের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হবো। বিশ্বসংস্কৃতির আধারে আমরা দান করতে সক্ষম হব। কেবলমাত্র তার থেকে গ্রহণ নয়। আমাদের ভূমিকা হবে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় নয়। ভারতকে ভারতীয়করণ জাতীয় চিন্তাকে সুসংহত করা জাতিকে সংগঠিত করা অগ্রগমণের পথ করে যাওয়া এসব আমাদেরই করতে হবে। আমাদের হয়ে অন্যেরা করে দেবে না।

আমরা এখন আর অন্যের দেওয়া কর্মসূচী গ্রহণ করছি না। আমরাই হবো আমাদের কার্য্যসূচীর রচয়িতা। আর কোন নীতি আমরা মানবো না। আমাদের সূচীপত্রের প্রথম এবং শেষ কথা পরিবর্তন। শিক্ষার নাম করে ক্রীতদাস আর কেরানী তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা নবিশীতে আহ্বান আমরা বহুদিন প্রত্যাখ্যান করেছি। এইসব জিনিষগুলিকে আমরা উপযুক্ত স্থানে রেখে দিয়েছি। বৌদ্ধিক দিক থেকে এখন আমাদের মুক্তি ঘটেছে বলা যেতে পারে। তাহলে এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে জরুরী কাজটা কি? আমাদের প্রথম মহত্ত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে প্রাচীন প্রজ্ঞাকে বর্তমানের উপযোগী করে রূপান্তরিত করা।

প্রাচীন শক্তিপুঞ্জকে নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করা। প্রাচীনের শক্তি বর্জিত নতুন রূপ পরিহাস ব্যতীত কিছু নয়। ভিন্ন দিকে অতীতের সব কিছুতেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরা আর এক ধরনের নিবুদ্ধিতা। পুরনো কালের ক্ষমতার আদিম কালাসঙ্গতি বিচার না করে গ্রহণে আমাদের তো পশ্চাদগতিই হয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে আমাদের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা বা পূর্বশর্ত আরোপিত হচ্ছে না। শুধু নির্য্যাসের মত আমরা গ্রহণ করব অতীতের গৌরব এবং প্রাচীনতার অভিজ্ঞতা পুষ্ট সত্যকে। আমাদের সম্মুখে আদর্শের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অভিযানের জন্য মুক্ত। জীবন কর্তব্য এবং স্বাধীনতার নব নব ধারণা হিন্দুত্বের চিরনূতন ভাবরাশি প্রেম ও বন্ধুত্বের অনেক অপরিক্ষীত অভিব্যক্তি সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। জ্বলন্ত তেজের সঙ্গে এর মধ্যে আমাদের নিক্ষেপিত করতে হবে। সব গুণরাশিকে আত্মস্থ এবং স্বীকরণ করে নিতে হবে। আমরা অবশ্যই প্রাণবন্ত ভাষায় এবং শব্দে ভারতের ইতিহাসে রচনা করব।

ইংরেজদের পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমান কাল অবধি ইতিহাস আসলে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু হয়েছে। তার ভেতরে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কতকগুলি অনিবার্য্য ভূমিকা। যার বিস্তৃতি কয়েক হাজার বছর। কৌতুকের কথা ভারতের ইতিহাসে ভারতই এখানে প্রায় অনুপস্থিত। এগুলো বিরক্তি উৎপাদক হলেও এখনি সর্বৈব বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এসব ইতিহাস রচনা নিঃসন্দেহে খুবই ছেলেমানুষী কাজ কিন্তু উদ্দেশ্যেপূর্ণ। অন্যান্য অনেক কাজের মত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লেখার কাজটিও শুরু হয়নি। অনাগত প্রজন্ম এই কাজটি সম্পন্ন করবে। সে ইতিহাস হবে মানবিক, আবেগধর্মী। ভারতে অধ্যুষিত জাতির তূর্য্যধ্বনি সদৃশ এবং দৈবী সুসমাচার সমন্বিত। এটা করতে হলে তাকে অবশ্যই অন্তঃস্থলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। কলকাতা

মাদ্রাজ বোম্বে হল বর্তমানে আমাদের লক্ষ্যস্থল। প্রাচীন রণক্ষেত্রে যে বীরপুরুষেরা শায়িত রয়েছেন তাঁরা আমাদেরই পূর্বপুরুষ। যাঁরা প্রশস্ত সড়ক প্রাচীর নগরী নির্মাণ করেছিলেন আমাদের জন্য। আর শান্তিশয়ানে আছেন অসংখ্য দেবদুর্লভ বিদ্বান পন্ডিতেরা। যাঁরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন অমূল্য ভাব সম্পদ এবং লিপিসমূহ। উর্দ্ধলোক তেকে তাঁরা তাঁদের উত্তর পুরুষদের অদ্ভুত শিক্ষাগ্রহণে তৎপরতা দেখে অশ্রপাত না করলেও কখনো কখনো নিশ্চয়ই হেসে উঠেছেন।

ভারতের ইতিহাস লক্ষ লক্ষ বৎসরের। সাম্প্রতিক ইতিহাসের কালস্তর অন্ততঃ তিনহাজার বছরের সত্যকে নিয়ে। সমুদ্রতলদেশ, নদীতীরের বালুকারাশি, অরণ্য ও জলাভূমি পুনরায় সমুদ্রপৃষ্ঠ একের পর এক স্তূপীকৃত হয়ে সাজানো। প্রতিটি যুগেই একটি নতুন স্থান ও বিষয় হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু। অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাটলীপুত্র, উজ্জয়িনী, দিল্লী, কাঞ্জীভরম, অমরাবতী এক নিঃশ্বাসে কতো নামই না করা যায়। কতো না সুন্দর এই ভূমি থেকে এইসব স্থানগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। পূজা ছাড়া দৈবী সুসমাচার হয় না। হে ভারত সন্ততিগণ তোমরা এসবের এবং সমগ্র অতীত গৌরবেতিহাসের আরাধনায় নিজেদের সমর্পণ করো। জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখর স্পর্শের জন্য আবেগের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করো। জ্ঞানানুসন্ধান এক ধরনের খনন কার্য্যও বটে। এ খনন কার্য্যে তোমরাই কোদাল গাঁইতি। কারণ বিদেশীদের নয় তোমাদের মধ্যে আছে ভাব ও ভাষা যা প্রাচীন মর্মবাণী উদ্ধার করে ভবিষ্যতের পথকে মসৃণ করে দেবে। বর্তমান হয়ে উঠবে সংগ্রামে উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ। ভারতের সত্যের সঙ্গে পাশাপাশি যা রয়েছে তা উৎসাহ হতাশা নয়। প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। এইসব সাহিত্যকর্মের দায়িত্বই হবে অতীতের কথা বলে বর্তমানকে রূপ দেওয়া এবং

ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেওয়া। ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ইউরোপের ভোগচিত্র নয়, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও কল্পনাশক্তিকে। ভারত যেমন কাউকে অনুকরণ করতে পারে না তেমনি বিদেশের ভাবনা আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞও থাকতে পারে না। অতীতের ইতিহাস শুধু সরল ভাষার লিখলে হবে না লিখতে হবে বর্তমানের ভাষায়। জাতির সাধারণ প্রার্থনার মতো ভাবীকালের জন্য আশা সমস্ত হৃদয়কে অবশ্যই ভরিয়ে দেবে। এইরূপ মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ওপর ফলপ্রসু নারী শিক্ষাও নির্ভর করে। এদেশে নারী সমাজের দুর্গতি কিছু কম নয়। শিল্পকলার অবশ্যই পুনর্জন্ম হবে।

সেটা আমাদের বর্তমানে জানা হবু ইওরোপীয়বাদের অক্ষম অনুকরণ হবে না। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য শিল্পকলার মত সহজ ভাষা আর নেই। একটি সঙ্গীত একটি ছবি এগুলো অগ্নিগর্ভ ক্রস কাষ্ঠের মত সমগ্র জাতির কাছে পৌঁছে গিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে। পোড়া কাঠের অমসৃণ 'ক্রম' স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের আহ্বান রূপে উপজাতিদের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে তাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করত। শিল্পকলা আবার নব রূপে জন্মগ্রহণ করবে। কারণ সে একটি নতুন জিনিষ দেখতে পেয়েছে তার নাম ভারতাত্মা। আহা যদি ব্রোঞ্জযুগের একজন চিন্তাবিদ হওয়া যেতো এবং দক্ষিণী পারিয়ার সৌন্দর্য্য প্রদান করা যেতো কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত পারিয়া, যে মাদ্রাজের সমুদ্র বেলাভূমির পথ ধরে দুলে দুলে চলেছে। মিলেটের রূপ ধরে সমুদ্র সৈকতে উষালোকে আরাধনারতা রমনীর চিত্রাঙ্কন। একটি তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলবে ভারতীয় নারীর সৌন্দর্য্য। তুলে ধরবে গ্রামের শা ত মন্দ্রাক্রান্তা ছন্দের জীবন যাত্রা। মন্দির ও গঙ্গার তীরে ভক্তিনম্র মানুষের আসা যাওয়া শিশুদের কলরব খেলাধূলা শ্রমিক ও গাভীগুলোর মুখ। ভারতের নিজের পক্ষে আরো অনেক

শিল্পী কবি সাহিত্যিক আবশ্যক। যারা তাদের নিপুন দক্ষতার আমাদের মধ্যে মহান এবং নতুন চিন্তা জাগাতে পারবে। আমরা চাই ভারতীয় রক্তের শিল্পী যারা চিত্রায়িত করবেন বরিষ্ঠ মানুষ ভীষ্ম যুধিষ্ঠির রানাপ্রতাপ শিবাজীদের এমনভাবে ফুটিয়ে তুলবেন যেন দৃষ্টিপাতেই রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। জাতি হিসাবে এসবের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র অনুভবের মাধ্যমে আমরা আগামী দিনের নতুন কর্তব্যের দিকে এগোতে চাই। বিশ্বের দরবারে ভারতের কথা বলবার জন্যই শুধু নয় ভারতের নিজের কাছেও তার বাণী তুলে ধরতে হবে। ভারতের সর্বত্র আমরা এক বিচিত্র মনুষ্যগোষ্ঠী দেখতে পাচ্ছি যারা পরিচয়ে ভারতবাসী কিন্তু ভারতবর্ষ তাদের কাছে অপরিচিত। ভারত আত্মাতাদের বোধ এবং প্রজ্ঞাব বাইরে।

তাই আমাদের শিল্প সাহিত্যের উদ্দেশ্যে বা ব্রত হবে দেশের মানুষের সামনে ভারতবর্ষের চিরায়ত মূল্যবোধগুলির নিয়ে বিচার বিমর্ষ। আচারে আচরণে আনা এবং তারপর ব্যাপক বিস্তৃত প্রচার। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের ক দৈবী মাতৃকার রূপ কল্পনা যা বারবার বাস্তবতার আবরণে আকার ধারণ ..র অবতীর্ণ হয়। এই রূপকল্পরই জাতির কাছে চিন্ময়ী দেশমাতৃকা রূপে নির্ণীত হয়। সারা দেশে প্রেরণা স্রোতে তৈরী করে। তুচ্ছ হয়ে যায় জীবন মরণ। অমানুষিক শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় দেশবাসীর মধ্যে। তারপর প্রতি পদক্ষেপে শুধু নিকটতর হবে বিজয়। যেহেতু এ যুদ্ধ শুধুমাত্র অস্ত্র সাপেক্ষ নয় তাই এর ফল হবে দ্বিবিধ। ভারতের পক্ষ থেকে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে কিছু যোগ করতে হবে। ভারতের জন্য নিজেকেই প্রথম একবাণী দিতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের এই সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ভালোরকম সংগ্রামের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তীদের অস্তিত্ব। আমাদের জাতীয় জীবন জাতীয় অপমানে আক্রান্ত জর্জরিত হয়ে রয়েছে এখনও। শুধু এখনো পর্য্যন্ত

চতুর্দ্দিক ঘেরাও হওয়া নগরীর একেবারে বাইরের অংশগুলো প্রায় অক্ষত রয়েছে। এই সুযোগে তাহলে আমরা একবার কামান দাগিয়ে দেখি।

হে অতীতের ঐতিহ্যমন্ডিত ভারত সন্তানগণ, তোমরা রাত্রির আগমনে ঢালের ওপর ঘুমুতে ভয় পাচ্ছো? নবীন আধ্যাত্মিকতার নামে ভারতমাতার নামে শপথ নিয়ে এগিয়ে চলো। আধুনিক বিশ্বের রত্নরাজির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো। ভারতমাতার বীর সৈন্যদল এগিয়ে যাও। ঘিরে ফেল দুর্গপ্রাকার। সবলে প্রবেশ করো নগর প্রাকারে। ওহে সৈন্য সাজাও। কষ্টে বিজিত উচ্চ দুর্গশীর্ষে সতর্ক দৃষ্টি রাখো অথবা পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করো। অন্যেরা যেন তোমাদের মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে যে শীর্ষস্থান জয়ের জন্য তোমরা সাগ্রহে চেষ্টা করেছিলে সেখানে আরোহণ করতে পারে। পবিত্রভূমি ভারতবর্ষ আমাদের কাছে মহাভারত হয়ে গেছে। বীরোচিত ভারতে পরিণত হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যত অতীতের অপেক্ষা অনেক বেশী আত্মত্যাগের সুযোগ এনে দিয়েছে। মহৎ কারণে পরিশ্রম করার আত্মবলিদানের সুযোগ সব জাতি এবং সব ব্যক্তির জীবনে আসে না। ভাগ্যবানদের জীবনেই আসে। আমাদের চারপাশে কোটি কোটি মানুষ কত হীন এবং সাধারণ কারণে জীবনাতিপাত করে থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে উত্তরপুরুষদের অনেক বেশি মহত্তর এবং উজ্জ্বল করার জন্যই যেন এই পরিস্থিতি। অভাবনীয় এই পরিস্থিতি প্রচলিত ঃ তিটি শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে। উন্নত এবং মহৎকর্মগুলি সহজে আমাদের সামনে এসে যাচ্ছে এগুলোকে ভাগ্য বলা যাবে না। বলতে হবে সুযোগ।

জয়লাভের অর্থও এখন ভিন্ন। যে ব্যক্তি স্বপ্নেও পরাজয়ের কথা ভাবেনি তার তুল্য অজেয় আর কেউ নেই। কারণ বিজয়ের বাইরে তার জন্য একটি জগৎ রয়ে গেছে। সন্ন্যাসী শব্দটিও এদেশে বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে।

অশিক্ষিত ভিক্ষুক শ্রেণীর মানুষেরাও গৈরিক বসনের কল্যাণে সন্ন্যাসী হয়ে যায় এবং শব্দটির মর্য্যাদা হানি করে। তাই এখন সন্ন্যাসী শব্দটিও আমার প্রভুর কৃপায় নতুন তাৎপর্য্য এবং দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। গৈরিক বসন কমন্ডলু এবং রুদ্রাক্ষই একজন সন্ন্যাসীর পরিচয় হবে না। বহুজনহিতায় নিঃস্বার্থপরতাই হবে সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ। বিজ্ঞান ও বিদ্যা এককথায় জ্ঞান যাঁদের আছে তারা যদি তা নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে অন্যের কল্যাণে লাগান তাকেও আমরা সন্ন্যাসী বলতে পারি। কিন্তু সকলের মধ্যে থাকতে হবে বীরভাব। বিজীগিষু মনোবৃত্তি। ঘিনঘিনে মিনমিনে সখীভাবের মানুষকে আমার গুরু দুচোখে দেখতে পারতেন না। বজ্রের মতো দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যের মতো সংযম ও কৃচ্ছসাধন, মহৎ হৃদয় ও নিঃস্বার্থপরতাই চিনিয়ে দেবে একজন সন্ন্যাসীকে। অপরের সেবাই হবে যার ব্রত কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি মুহূর্তে হয়ে উঠবেন ক্রুদ্ধ দূর্বাশা। তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। জঙ্গী হিন্দু বা মারমুখী হিন্দুত্বের সন্তান এমনই হবে। এর চেয়ে অন্যরকম কিছু নয়।
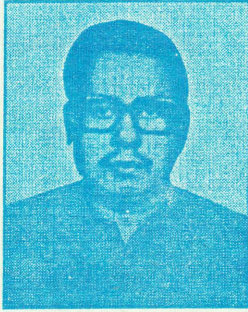
শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা